হে সখা –চিরসখা

পীযূষ ভট্টাচার্য

আমি এবং নবারুণ ও তাঁর হারবার্ট

যা প্রথমেই বলে নিতে চাই নবারুণ ভট্টাচার্যর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। এর রসায়ন এমনই বোধ হয় -- সমপ্রাণতামূলক রসবিশেষ। আর, জেনেবুঝেই কিন্তু 'বন্ধু' শব্দটি ব্যবহার করছি না। এই জন্য যে, 'বিচ্ছেদ' শব্দটি যোগ করে একটি শব্দবন্ধ আছে। ইদানিং এ শব্দটির প্রতি একধরনের বিদ্বেষ কাজ করে ভেতরে। মনে-প্রাণে এই শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। সেহেতু বৈষ্ণবী 'সখ্য' শব্দটি থাক আপাতত। কিন্তু ব্যক্তিক অনুসঙ্গ সহ একটা লেখা লিখতে গেলে বাছাই পর্বটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সেজন্য, কিছু মুহূর্তের কথা এখানে উল্লেখ থাকবে। আর একটি বিষয় জানাবার আছে, যে সম্বোধন আমরা দুজন ব্যবহার করতাম পরস্পর -তাই থাকছে। চেষ্টা করে দেখেছি সাহিত্যের মান্য অনুসারে সম্বোধনে লেখাটি লেখা সম্ভবপর হচ্ছে না ।

আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে মহাশ্বেতাদিকে জানতাম, নবারুণকে চিনতাম না। কিন্তু তাঁর কবিতায় আচ্ছন্নিত হয়েছিলাম সে সময়েই। তখন একদিন মহাশ্বেতাদির বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িতে দেখা, ভেতরের ঘরে মহাশ্বেতাদির সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে গেল। সঠিক বলতে, ওঁকে চিনতাম না বলে কোন মাথাব্যাথাও হয়নি -- কে এলো,কে চলে গেল। মহাশ্বেতাদির বাড়িতে এ নিত্য ব্যাপার - মাথা ঘামাবার কে হে তুমি ? কিন্তু চলে যেতেই মহাশ্বেতাদি বললেন 'বাপ্পা এসেছিল।' কে বাপ্পা ? এই বাপ্পা যে নবারুণ তখনই জানতে পারি। সত্যি বলতে কি সেদিন আমার খারাপই লেগেছিল দুটি কারণে, এক হচ্ছে -- মহাশ্বেতাদি তাঁর ছেলের সঙ্গে আলাপ না করিয়ে দেবার জন্য। অপরটি হচ্ছে, আমি একজন বসে আছি, ততদিনে 'বর্তিকা'তে দুটি গল্প বেরিয়ে গেছে, যতদূর জানা ছিল খাঁপুরের তেভাগার উপর আমার কাজটি সকলের নজরে এসেছে, তাকে উপেক্ষা ! অহং ঠিক নয়, মফঃ অভিমান। নবারুণকে প্রথম দেখা বলে এর উল্লেখ করা হলো মাত্র। অন্য কিছু নয়।

১৯৯২ তে প্রমায় প্রকাশিত 'হারবার্ট' পড়েছিলাম অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য-র দৌলতে বালুরঘাটে বসে, অফপ্রিন্ট অবস্থায়। অনিন্দ্য-র আমার পাঠাভ্যাস জানা থাকায় কলকাতা থেকে এনে দিয়েছিল তা। আমি কিন্তু অফপ্রিন্টটি বাঁধিয়ে বই তৈরি করে নিয়েছিলাম যাতে করে বার বার পড়া যায়। বই হলে লেখাটি একক হয়ে যায় -- পাঠের অন্য এক অনুভূতি জন্ম নেয়। কেন যে সেদিন লেখাটি পড়ে মনে হয়েছিল, যদি নবারুণ এ লেখাটি না লিখতে পারতো তবে ওঁকে আত্মহত্যা করতে হতো। কিছুদিন আগেও ক্রিয়াশীল ছিল তা। তাই হঠাৎ হঠাৎ সময়ে অসময়ে ফোন করতাম শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরটি শুনবার জন্য। ওঁর স্পষ্ট-অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরই ওঁ কেমন আছে, আমাকে আস্বস্ত করত। আর তখনই মনে পড়ে হোমোস্যপিয়ানের ফসিল আবিষ্কারের কথা, যার সাহায্যে জানা গিয়েছে আফ্রিকার ১৫০টি নরগোষ্ঠীই এই মৃত্তিকা বিশ্বের সমস্ত মানুষের পূর্বপুরুষ।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে কিছু নিজের কথা বলে নিই। আমার দাদু আত্মঘাতী হয়েছিলেন যখন তখন আমার মায়েরা ছোট। দাদুর শ্রাদ্ধে পেল্লাই সাইজের একটা ওভারকোট দেওয়া হয়েছিল। মৃত দাদু নাকি স্বপ্নে এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন -- মৃতের যুক্তি ছিল ওরকম একটা ওভারকোট পরে ঘুরলে তাঁর ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে না। আর একটি ওভারকোট বাবা আমাকে দিয়েছিলেন রেলের গার্ডের কাছ থেকে কিনে, সেকেন্ড হ্যান্ড এবং তা ছিল আমার শরীরের খাঁচা থেকে বড় । তথাপি ওটা আমাকে পরতেই হতো, যৌবনে দ্বিতীয় কোন শীতবস্ত্র না থাকায়। আড়ালে বন্ধুদের আলোচনার বিষয় ছিল -- কী করে বহন করি ভারি ওভারকোট ? মুখে অবশ্য সেদিন একথা বলেনি তারা কেননা আমার দারিদ্রকে পরিহাস করা হবে বলে। আমি কৃতজ্ঞ সেইসব বন্ধুদের প্রতি। এসব সত্ত্বেও নবারুণ আরও একটা ওভারকোট উপহার দেয়। এ পাওয়া বড় পাওনা। বলতে দ্বিধা নেই হারবার্ট যেন শ্মশানে ধুমধাড়াক্কা বাঁধিয়ে, চলতি ভাষায় এ্যাকসন করে আমার শহর অ্যাবস্কন্ড করে আছে সেই থেকে। অ্যাবস্কন্ড করা মানুষ ওভারকোট পরবে ধরে নিয়েই হারবার্ট বা হারবার্টের প্রেতাত্মার খিদমদগারি করে চলছি।

আমাদের মাঝখানে হারবার্ট আছে এবং ছিল বলেই এ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই বোধ করি সম্পর্কটা এমন করে দিয়েছে। সেই অর্থে নিজের, নিজেদের লেখালেখি নিয়ে সেরকমভাবে আলোচনাই হয়নি কোনদিন। তবে দু-একটি ঘটনা এমন আছে যে উল্লেখ করতেই হয়। পচন প্রক্রিয়া (১৯৯৯) গল্পটি বিশেষ একটি কাগজ (অনুল্লেখ থাক নামটি) ছাপবে বলে সংবাদ দিয়ে শেষ মুহূর্তে জানায় হারিয়ে গেছে। খারাপ লগেছিল তা, নবারুণকে তা জানাতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রমাতে ছাপিয়ে গল্প নিরুদ্দেশ হবার জন্য যে মন্তব্য করেছিল তা এখন থাক। কেননা গল্পটি শেষই হয়েছিল।

'.... কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নই' এই বলে। 'নিরক্ষরেখার বাইরে' উপন্যাসের উট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তালাশ ওঁই জোগাড় করে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশের সব দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিল। যা বলবার জায়গা এখানে না হওয়া সত্ত্বেও বলতেই হচ্ছে -- নিরক্ষরেখার বাইরের চরিত্ররা দু-বেলা গালমন্দ করে চলছেন যারাই উপন্যাসে নিজের আদল খুঁজে পাচ্ছেন। এ খবর নবারুণকে বলতেই উত্তরে এক চিলতে হাসি। এ হাসি যে কী, তা জানি।

প্রথমেই বলেছি দু-জনের মাঝখানে একজন হারবার্ট আছে। আছে যে তা হাড়ে হাড়ে টের পাই যখন ঘরবন্দি অবস্থায় থাকি। ঘরবন্দি অবস্থার সময়কালকে যুৎসই টার্মে ব্যবহার করি আজকাল, পৈতে হয়ে যাবার পর ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা যেন ! সেই ছেলেবেলায় পৈতে হবার সময় শোনা এই অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হয়ে মারা গেলে নাকি মুক্তি নেই। আকাশপথে শূন্যে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলাচল করে। সেই শব্দের ঠিক নিচে ভূ-এ দাঁড়িয়ে ভাবি এ শব্দ কোন রাতজাগা পাখির তীব্রগতির মধ্যে চক্রাকারে ডেকে ওঠা নয়, হারবার্টই যেন ব্রহ্মচারী হয়ে গেছে। নবারুণের কাছেই শোনা, বহুদিন উপন্যাসটিকে আটকে রেখেছিল। আগলে কি ? যেদিন ছাপতে দিয়েছিল তখন নাকি ভীষণ রিক্ত মনে হয়েছিল নিজেকে। কেঁদেছিল। কোন অবসেসড্ হারবার্ট নয় অন্যধরনের অন্যরকমের, অনেকটা ব্রহ্মচর্যের সময়কালে মৃত হারবার্ট কেবলই আকাশের বুকে দন্ডি ঠুকে শব্দ তুলে চলে যাওয়া, শূণ্য ও শক্ত জমিন ! এ যাওয়া যে দেখে যাওয়া -- কেমন আছি আমরা ? এরকমই মনে হয় সবসময়।

যাদবপুর থানা স্টপেজ থেকে তুলে নিয়ে রবীন্দ্র সরোবরের গাছতলায় একদিন, এক সন্ধ্যা, চোখ সহানো অন্ধকার। ঘন সমস্ত ছায়াই তখন যুবক-যুবতীর দখলে, আমাদের দু-জনের জন্য অমানিশার পরবর্তী সময়ের চাঁদের ম্লান আলোর এক প্রান্তর -- তাই সই। সেখানে বসে 'বিনু' চলে এলো একরাশ প্রশ্ন নিয়ে -- প্রশ্নের তোড়ে লেকের জল যেন তির তির করে কেঁপে উঠছে তখন নবারুণ অনেক কথার মধ্যে বলে উঠেছিল -- জলে ভেসে থাকবার কৌশল জানা যে কত জরুরি।

যখন খারাপ থাকত কি করে যেন খবর পেয়ে যেতাম। বেশ কিছুদিন আগে পুরুলিয়া গিয়ে অসুস্থ হয়েছিল। শুধু খবরটাই পেয়েছিলাম। কোনভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না বলে মহাশ্বেতাদিকে ফোন করতেই বকুনি যা দিলেন তা হচ্ছে সোজা বাংলায় এক্কেবারে ঝাড়। আমি নাকি বাপ্পার খোঁজখবর ইদানিং ঠিকমতন রাখি না ইত্যাদি। কলকাতা যাব কিনা প্রশ্নের উত্তরে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন -- এসে কি করবি ? হাসপাতালে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবি ? বাপ্পার বেডের সামনে বসে অক্সিজেনের বুদবুদ গুনবি ? প্রণতি, বাউ আছে আমি তো আছিই - খোঁজ নিস বলে বাউ-এর মোবাইল নম্বরটি দিয়ে দিলেন।

নিয়মিত টেলিফোনে খোঁজ নিয়েছি। যতদিন পর্যন্ত নবারুণ নিজমুখে অর্থাৎ কণ্ঠে বলতে পারেনি ভালো আছি ততদিন দেখা করতে যাইনি। তবে যেদিনই জড়ানো গলা শুনলাম ভালো আছি তখনই চলে এসেছি দেখতে। এই সেদিন নার্সিংহোমে ভর্তি হলো, আমিও কলকাতায় তবুও ফতোয়া খবরদার নার্সিংহোমে আসবি না, এলাকাটা তুই ঠিক চিনতে পারবি না। ওরা খবর দেবে। এবারের ওরা বলতে প্রণতি-বাউ ছাড়া রাজীব চৌধুরীরা।

সবাক নবারুণের থেকে নির্বাক নবারুণের সঙ্গে সখ্যতাটা বেশি ছিল। আজ থেকে প্রায় বছর দশের আগের কথা, অরবিন্দ সেবা সদনে আমার এক বছরের নাতনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, পাশে কেউ নেই, নবারুণ জানতো এ সময়ে কলকাতায় আসবো, খবর নিয়ে জানতে পেরে ছোট্ট মেয়েটার লড়াই-এর সঙ্গী হয়ে গেল নিঃশব্দে। বালুরঘাটে একবার এসেছিল, দিনদুই যত পেরেছে শুধু মানুষ দেখেছে। সাহিত্যের আড্ডায় তত্ত্বকথা চলছিল, ওঁর পালা আসতেই গল্প পড়েছিল একখানা। গল্পে যে তত্ত্বকথা আছে সেটিই তাঁর বলবার বিষয়। তান্ত্রিক কী তন্ত্র সাধনা হাটের মধ্যে করে ? তান্ত্রিকের তন্ত্রটাতো রীতিমত তত্ত্ব, তা তো নিভৃতেই করতে হয়।

এখন আর অবরে সবরে কলকাতা যাই না, বছরে নিয়ম করে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দুবার আরও বার-তিনেক হয়ে যায়। বড় মেয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সরজমিনে সদলবলে নবারুণ-প্রণতি দেখে এসেছে কেমন তা। কেননা ওঁ চায় মাঝেমধ্যে কলকাতাতে থাকি। এর চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিল -- বালুরঘাটে যে পাখিটি গাছের কোটর থেকে সকালে উড়ে যায় সন্ধ্যায় সেখানে ফিরে আসে। বড় নিশ্চিন্ত জীবন। এখানে তা হয় না। একবার উড়লে সে পাখি যে বাড়ি ফিরবেই তার নিশ্চয়তা নেই। এক অনিশ্চয়তার সন্ধান। তা প্রতিনিয়তই এক চাপ থেকে যায় লেখালেখিতে কেননা বর্গির হামলার মধ্যেই আমরা ঘুমাতে অভ্যস্ত।

এখান থেকে পাঁচশ মাইল ভাটিতে গিয়ে নবারুণের সঙ্গে দেখা হওয়া সত্ত্বেও খুউব কী কথা হয় ? আমার মনে হয় নির্বাক মুহূর্তগুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ও সামনে আছে বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে, আমি নির্বাক। নির্বাক কী ? না, আমরা কথা বলেই চলছি, যেভাবে অন্তরঙ্গ মানুষেরা কথা বলে চলে -- যার প্রতিটি শব্দই উচ্চারিত হচ্ছে অথচ কাউকে না শুনিয়ে। কিন্তু যে শোনার সে ঠিক শুনছে -- আমিও শুনি।

নবারুণ তো মাঝমাঠের নিরাপদতম খেলার পথটা বাতিল করে বর্ডার লাইন বরাবর ছুটছে। রক্তমাংসের মানুষের শরীর থেকে একচিমটে জমে থাকা মাটি তুলে এনে বুঝিয়ে দিচ্ছে -- এই হচ্ছে মানুষটির মহত্ত্ব ওটা হচ্ছে মানুষটির নোংরামি। এক চিমটে মাটির মধ্যে সব আছে। তুমি তোমার অবস্থান ঠিক করে নাও -- যদি মনে করো

মাঝামাঝি থাকবে, থাকো। অথবা যে কোন এক পক্ষেও থাকতে পারো, আবার মহত্ত্ব আর নোংরামির মহাঘোটেও থাকতে পারো। সঙ্গীতের সম এর স্থান নির্দিষ্ট, সেই রকম সমেও থাকতে ভালোবাসে বলেই উচ্চারণহীন কথোপকথন চলতেই থাকে।

হারবার্ট ভবানীপুরের কোন রাস্তায় হাঁটতো নবারুণ চিনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বহু চেনা সত্ত্বেও ওঁর বাড়ির সামনে এসে প্রায়ই পথ হারিয়ে বেভুলে পাখির ডাক শুনতে থাকি। এরকম পাখির ডাকের মধ্যে শুনতে চাই অনিশ্চয় সময়ের কথা কি ? যার সংকেত উঠে এসেছিল আমাদের কথার মধ্যে একদিন। আর একটা জানবার বিষয় আছে ওঁর কাছে কিন্তু প্রতিবারই অন্য কথার চাপে তা হারিয়ে যায়। এখন আবার মনে পড়ছে -- হারবার্ট এর প্রথম পাঠক কে ? কে পড়েছিল প্রথমা ম্যাডাম (প্রণতি) কি ?

তবে, আমাদের উচ্চারণহীন কথার মধ্যে সখাকে প্রশ্ন করে উঠতে পারি চিৎকার করেই যে কোন দিন। তা হচ্ছে, ওঁ হারবার্টের ঔরসে একটা বাচ্চা পয়দা করলো না, বেজম্মাই সই। যার জন্মটা হতো ১৯৯২-এ, বেঁচে থাকতো আমার মৃত্যু অবধি।